দাঙ্গার গল্প
দাঙ্গার বিরুদ্ধে

[সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গল্প সংকলন]

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সাহিত্য ব্যাপারটি দেশ-কাল-সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা ও সংকট অনেক গল্পেরই জন্মের মূল কারণ।

ভারতবর্ষের শতাব্দীব্যাপী আর্থসামাজিক কাঠামো, ধর্মীয়, রাজনৈতিক (এবং অন্য নানাবিধ) পটভূমি বহু গল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

'সাহিত্য সমাজের দর্পণ' কথাটি বহু ব্যবহারে শুনতে ক্লিশে ঠেকলেও, আক্ষরিক অর্থে এর অন্তর্নিহিত সুগভীর সত্যতাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা চলে না। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে আছে দেশ-কাল-সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া নানা ধরনের ঘটনার অভিঘাত। একে গল্প সৃষ্টির অনিবার্য আন্তর তাগিদও বলা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

১৯৪৬-এ শুরু হয়েছিল সর্বগ্রাসী ভয়ংকর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। কলকাতার সেই ভয়াবহ দাঙ্গা তথা 'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'-এর নায়ক ছিলেন হাসান শাহিদ সুরাবর্দি। এর ভয়ংকর স্মৃতি অনেকের মনে আজও দগদগে হয়ে আছে।

তারও অনেক আগে থেকেই ইংরেজরা এসেছিল বিভেদের সূক্ষ্ম ছুরিকা হাতে। তারা হিন্দু ও মুসলমানে যে সামান্য ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলোকে তারা ক্রমাগত ব্যবহার করতে থাকে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে।

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তী বছরেই (১৯৪৬) ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে শুরু হয়ে গিয়েছিল ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভারতবর্ষের মানচিত্রের ব্যাপক রদবদল ঘটে গেল ১৯৪৭-এর পনেরোই আগস্ট। স্রেফ ধর্মের ভিত্তিতে জন্ম হল দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের। হিন্দুস্থান (ভারত) ও পাকিস্তান। পরবর্তীকালে আবার ভাগ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

সেই ভয়াবহ দাঙ্গায় বিভ্রান্ত হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা গান্ধিজির পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে (মহাত্মা গান্ধি জিন্নার দেশভাগের প্রস্তাব কখনই মেনে নেননি। তাঁর মতে সমস্যা সমাধানের জন্য দেশভাগ আদৌ অপরিহার্য ছিল না।), শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভের জন্যই শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নেন (দেশভাগকে একটি 'মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক' প্রস্তাব হিসেবে স্বীকার করেও শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভের জন্যই নেহরু ও প্যাটেল দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন।)।

তাঁরা কী জানতেন না, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল অভিপ্রায় কী ছিল? তাদের চক্রান্ত ছিল, দেশভাগের মধ্য দিয়ে দুটি রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেওয়া এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপমহাদেশের দুই বৃহৎ ধর্মের ভেতরে কৌশলে সাম্প্রদায়িকতার মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তেমনি দেশভাগের পর দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে তারা সর্বক্ষণ সচেষ্ট থেকেছে। ফলে দুটি রাষ্ট্রে বিরোধ যে-ই প্রকট হয়েছে, অমনি দুই

রাষ্ট্রের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়েই তুলেছে। লাগিয়েছে দাঙ্গা। সংখ্যালঘুদের ওপর চলেছে অমানুষিক নির্যাতন।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট দিনটা ছিল ভয়াল, ভয়ংকর। ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। ১৭ আগস্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায়, সকাল থেকেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নানা স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। দাঙ্গার আশঙ্কায় জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লিগ মন্ত্রিসভা ১৬ আগস্ট তারিখে ছুটি ঘোষণা করে। তাতে ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। সকাল থেকে বেপরোয়া ভাবে দোকানপাটে হামলা চালিয়ে লুঠ করা হয়। ছুরির ঘায়ে মারা যায় অসংখ্য মানুষ। বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগানো হয়। ট্রাম, বাস সব কিছু বন্ধ থাকে। আহত অবস্থায় শুধুমাত্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৫০০ লোককে ভর্তি করা হয়। তার মধ্যে ৬৪ জনেরই মৃত্যু ঘটে। পোস্ট আপিসে আগুন লাগানো হয়। খবরের কাগজের আফিসগুলিও অক্ষত থাকে না দাঙ্গাবাজদের হামলায়।

এই দাঙ্গার সূত্রপাত ক্যাবিনেট মিশনের ব্যর্থতায়। মুসলিম লিগ ঘোষণা করে, দেশের মুসলমানদের সামনে নিয়মতান্ত্রিক পথে পাকিস্তান আদায়ের পথ আর খোলা রইল না। সুতরাং তাদের মতে, পথ তখন একটাই। আর তা হল, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তা না হলে, মুসলিম লিগের আশঙ্কা, ভারতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাজ। মুসলিম লিগের মতে, ভারতীয় রাজনীতিতে ন্যায় ও সুবিচারের কোনো ঠাঁই নেই। আর সে কারণেই তারা দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় ১৬ আগস্ট।

মুসলিম লিগ সরকার সে সময় বাংলার গদিতে আসীন। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি। ১৬ই আগস্ট কলকাতায় বেপরোয়া লুঠতরাজ ও খুনজখমের মাঝে পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের। ১৬ তারিখ রাত ৯টায় সরকার কার্ফিউ জারি করে। কিন্তু পরের দিনই, ১৭ আগস্ট কলকাতার পার্ক স্ট্রিট ও পার্ক সার্কাস অঞ্চলে দাঙ্গা বেঁধে যায়। সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। দুপুরে রাস্তায় নামানো হয় সৈন্যবাহিনীকে। তবু তার মধ্যেও খুনোখুনি, লুঠপাট, দোকান-ঘর-বাড়িতে আগুন লাগানো চলতেই থাকে। পুলিশ, মিলিটারি, সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে।

সমকালের পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায়, চারদিন ধরে গোটা শহর দুই সম্প্রদায়ের গুন্ডাবাহিনির দখলে চলে যায়। দেশে কোনোরকম আইন, শাসন কিছু নেই। ফলে লুঠেরা, খুনিরা প্রকাশ্য রাজপথে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে সময়, অর্থাৎ, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই চোরা বাজারে সমস্তরকম অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসে পাওয়া যেত। দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে দোকানপাট, গৃহস্থের ঘরবাড়ি, ছাত্রছাত্রী হোস্টেল কিছুই রক্ষা পায়নি।

সে-সময়ের প্রতিটি কাগজেই, এই ভয়াবহ দাঙ্গার জন্য অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় মুসলিম লিগ ও বাংলার লিগ সরকারকে। কাগজে, একটা পরিসংখ্যানে প্রকাশ করা হয়, কলকাতার দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা ৫,০১৮। আহতের সংখ্যা ১৩,৩২০। এই সংখ্যা এর থেকে বেশি ছাড়া কম নয়।

শুধু কলকাতা নয়, 'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং' বা কলকাতার কুখ্যাত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আরও নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই দাঙ্গার সূত্র ধরেই ১০ অক্টোবরে নোয়াখালি ও কুমিল্লায়

শুরু হয় ভয়াবহ হাঙ্গামা। তার আগে কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ছোটোখাটো দাঙ্গা ঘটে যায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পাবনায়। নোয়াখালিতে দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারণ করে। টানা ১৫ দিন ধরে সেখানে চলে লুঠতরাজ। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, অসংখ্য ধর্মস্থান ধ্বংস করা, নারী ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরিত করা—এসব চলতেই থাকে। ৫০ হাজারের বেশি নরনারী এই দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সে-সময়ের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এ-প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : 'সমগ্র নোয়াখালি জেলায় ও ত্রিপুরা জেলার স্থানে স্থানে যে বর্বরতা ও অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হাজার হাজার লোককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়, যাহারা তাহাতে বাধা দেয়, তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া স্ববংশে নিধন করা হইয়াছে।.....দুর্বৃত্তরা হিন্দু মহিলাদিগকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ নিজ গৃহে আটক করিয়াছে। এখনও এইরূপ বহু নারী বোরখার মধ্যে আবৃত থাকিয়া পশু জীবনযাপন করিতেছে।'

নোয়াখালির পর আগুন জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে বিহারে। সেটা ১৯৪৬-এর ২৫ অক্টোবর। এক আগুন থেকে আর-এক আগুন ক্রমাগত জ্বলতেই থাকে। বিহারের দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৭ হাজার। পাঞ্জাবে ৫০ হাজার সীমান্তরক্ষী মোতায়েন করেও বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবে শেষ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লক্ষ। সেখানকার এক লক্ষ তরুণীকে অপহরণ করা হয়েছিল। দেশছাড়া হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। খবরে প্রকাশ, ভারত বিভাগের দিনগুলিতে দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ।

বাঙালি লেখকদের কাছে এই ভয়ংকর সময়টা ছিল অত্যন্ত জরুরি ও মর্মবিদারক। ফলে দাঙ্গার বিরুদ্ধে, কুৎসিত হিংস্রতার বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাধারণ সব ছোটো গল্প লেখা হয়েছে এ-সময়ে।

॥ ৩ ॥

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট কলকাতায় শুরু হয়েছিল সর্বগ্রাসী ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ('গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং')। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পটির রচনাকাল ১৯৪১ (২৪-২৫ জুনে লেখা ; ১৩৬২-র 'ঋতুপত্র' পত্রিকায় বর্ষা সংখ্যায় এই গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল)। স্বভাবতই এটি '৪৬-এর সেই ভয়াল-ভয়ংকর অভিজ্ঞতার আগেই লেখা (তেমন একাধিক গল্প, দাঙ্গাবিরোধী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেই, এই সংকলনে সন্নিবেশিত করেছি আমরা।)। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটি আমরা নির্বাচন করলাম, তার একমাত্র কারণ গল্পকারের নাম রবীন্দ্রনাথ বলেই নয়। দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে লেখা প্রতিটি গল্পেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লেখকগণ, দাঙ্গার মর্মান্তিক পরিণতি দেখিয়ে, শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বানই জানাতে চেয়েছেন মানুষের কাছে।

'৪৬-এর দাঙ্গা প্রত্যক্ষ না করেও রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে একটি উদার, সাহসী, কার্যকরী, বাস্তবসম্মত পথ দেখিয়ে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে লেখা শেষতম গল্পটির ('মুসলমানী গল্প') মাধ্যমে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভাবনার এই বিশিষ্ট গল্পটিকে বাদ দিয়ে দাঙ্গা বিরোধী 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গল্প-সংকলন' কখনই সম্পূর্ণতা পেতে পারে না বলেই আমরা মনে করি।

॥ ৪ ॥

শুধু জীবনের শেষপ্রান্তের এই শেষতম গল্পই নয় ; রবীন্দ্রনাথ বারবার ভেবেছেন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে।

এই দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি নিয়ে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিটি কেমন ছিল? দেশের সামগ্রিক মঙ্গল ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বারবার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক মিলনের কথা বলেছেন।

'ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দু-মুসলমানের কেবল যে মিলিত হতে হবে তাই নয়, সমকক্ষ হতে হবে। এই সমকক্ষতা তালঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।'

এই হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের সমস্যা কতখানি জটিল ও গভীর তা রবীন্দ্রনাথ বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই জানতেন। তাই লোকহিত প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যটা আমাদের সমাজে এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছে যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না।'

সংখ্যাগুরু বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বারংবার আত্ম সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে পূর্ববঙ্গে। সেখানে তাঁর প্রজাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। কাছারি বাড়িতে মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকায় তিনি যথেষ্ট মানসিক কষ্ট পেতেন।

রবীন্দ্রনাথ অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন, মিলনের জন্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মুসলিমদের যে ডাকা হয়েছে, তাতে তেমন আন্তরিক তাগিদ ছিল না আদৌ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ধর্মমতের দিক দিয়ে হিন্দুদের গোঁড়ামি কিছুটা কম হলেও আচারে তাঁরা বড়ো শক্ত, কঠিন। আর মুসলমান ঠিক তার বিপরীত। আচারে মুসলমান নরম হলেও, ধর্মমতে কিছুতেই সমঝোতা করতে তাঁরা রাজি নয়।

তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে ; আত্মীয়তা দিয়ে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।'

ভেতর বাইরের এত সব সমস্যার কথা জেনেও রবীন্দ্রনাথ দুই সম্প্রদায়ের মিলনের কথা, সে ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক প্রবল ইচ্ছের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। তাঁর রচিত গল্পের অসংখ্য চরিত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের।

'মুসলমানী গল্প' রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ লেখা ছোটো গল্প। সে-বছরেই (১৯৪১) এই মহামানবের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

সূচিপত্র

গল্পের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
দাঙ্গা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৩
স্বাধিকার	অঞ্জন সেনগুপ্ত	৩৮
কাফের	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫
আইনদ্দির দেশ	অভিজিৎ সেনগুপ্ত	৫৪
শোভারানি	অমর মিত্র	৬৫
স্বদেশে সংসারে	অমলেন্দু চক্রবর্তী	৭৮
জ্বর	অমিতাভ দেব চৌধুরী	৯০
আপাতত কোনো সতর্কবার্তা নেই	অলোক গোস্বামী	১০০
শিল্পী	আনসারউদ্দিন	১০৯
আত্মপক্ষ	আফসার আমেদ	১১৬
অন্য নকশি	আবুল বাশার	১২৫
মর্গে দুখিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ	উদয় ভাদুড়ী	১৪১
ফ্যাচাংয়ের রংরুটে একদিন	উৎপল ঝা	১৫২
মানবতা কাঁদো	কানাই কুণ্ডু	১৫৮
ধুতরো ফুলের গন্ধ	কালিদাস ভদ্র	১৭০
ধর্মসংকট	কিন্নর রায়	১৭৪
যাহা যায়	গৌরকিশোর ঘোষ	১৮৪
ছিঃ	গৌর বৈরাগী	১৯১
ঘৃণার সমস্যা	জয়া মিত্র	১৯৬
লজ্জা	জাহান আরা সিদ্দিকী	২০৫
ছিন্নমূল	জীবন সরকার	২১০
কৃষ্ণমণি হাঁটে	ঝুমুর পাণ্ডে	২১৫
কিছু মুহূর্ত সংকটের	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	২২২
ইতিহাসের কারিগর	তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	২৩৬
পাইন বনে হলুদ জুঁই	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪১
হিন্দু	দিব্যেন্দু পালিত	২৪৯
হনন-কথা	দীপংকর কর	২৫৯
দাঙ্গার দিকে	দীপঙ্কর দাস	২৬৬
এই বধ্যভূমে	দেবব্রত চৌধুরী	২৭৪
পরিস্থিতি প্রকরণ	দেবব্রত মল্লিক	২৮৮
উদ্বাস্তু	দেবেশ রায়	২৯৩
কাফের	ননী ভৌমিক	৩০৫

কাকতাড়ুয়া	নবারুণ ভট্টাচার্য	৩১৫
ত্রাণকর্তা	নবেন্দু ঘোষ	৩২২
পালঙ্ক	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৩৪
উস্তাদ মেহেরা খাঁ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫৪
দাঙ্গা	নীহারুল ইসলাম	৩৬৮
আহা যদি অহর্নিশি দাঙ্গা হত	পরম ভট্টাচার্য	৩৭৯
দাঙ্গা	পরিতোষ তালুকদার	৩৮৭
পচন প্রক্রিয়া	পীযূষ ভট্টাচার্য	৩৯২
দাঙ্গার সময়	বনফুল	৩৯৮
বরকত যখন জানত না সে শহিদ হবে	বশীর আল্‌হেলাল	৪০২
সখ্য	বিজিত ঘোষ	৪১২
অন্তরে	বিমল কর	৪১৯
বর্ণপরিচয়	বীরেন শাসমল	৪২৫
মায়ার আড়াল পেরিয়ে	মণি মুখোপাধ্যায়	৪৩৭
দুই শত্রু	মনোজ দাশ	৪৪৭
ভালোবাসা	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫২
শেয়ালগুলো	মিথিলেশ ভট্টাচার্য	৪৫৬
অন্তর্তদন্ত	মিহির ভট্টাচার্য	৪৬২
দৌড়	রতন শিকদার	৪৭২
মুসলমানীর গল্প	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৭৮
সাদা ঘোড়া	রমেশচন্দ্র সেন	৪৮২
হিন্দোস্তাঁ হামারা	শচীন দাশ	৪৮৬
দিমালপাড়ের তারাবানু	শর্মিলা দত্ত	৪৯৫
আজান	শেখর দাশ	৪৯৯
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রিপোর্ট	শৈবাল মিত্র	৫০৭
গণনায়ক	সতীনাথ ভাদুড়ী	৫১৪
দ্বিতীয় জন্ম	সত্যপ্রিয় ঘোষ	৫৩০
ভারতবর্ষের মেয়ে	সনৎ বসু	৫৪৭
আদাব	সমরেশ বসু	৫৫২
ড্রেসিং টেবিল	সলিল চৌধুরী	৫৫৮
মীরাতুনের কবর	সাধন চট্টোপাধ্যায়	৫৬৬
স্বর্গ হইতে বিদায়	সাবিত্রী রায়	৫৭৫
ডানাকাটা লাল ওড়না	সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য	৫৮২
শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৮৭
শহিদের ভিটে	সুবল সামন্ত	৫৯৮
একটি তুলসী গাছের কাহিনি	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	৬০৪
নেকড়ে	সৈয়দ মুজতবা আলী	৬১১
দাংগা	সোমেন চন্দ	৬১৫

দাঙ্গা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এপারে আদমপুর ওপারে ধুলেশ্বর। দুই গ্রাম। মাঝখানে অনেক আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পুল ছিল একটা। তার কাঠ আর লোহা দুই গ্রামের লোক চুরি করে নিয়েছে। এখন শুধু একটা দুই-বাঁশের সাঁকো। বাঁশের ধরুনি আছে ওপর দিকে। হেলে-বেঁকে।

কাঁকালে কলসি, চলেছে মমিনা। ত্যাড়াবাঁকা সাঁকোর ওপর দিয়ে। ধরনি ধরেই। হাতে খোঁটা দড়ি, চলেছে জিন্নাতালি, তেমনি নড়নড়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে। তেমনি ধরুনি না ধরেই।

এপারে পুকুর, ওপারে গোবাট। গোরু আগেই হেঁটে পার হয়ে গেছে... জলের থেকে নাকের তুলতুলে ডগাটা উঁচুতে তুলে ধরে। নদীর জল লোনা পুকুরের ছাড়া খাওয়া যায় না। গোরুকে খোঁটায় বেঁধে না রাখলে কার খেতের ফসল কখন তছনছ করে।

মমিনা আর জিন্নাত। ধুলেশ্বর আর আদমপুর। দক্ষিণ আর উত্তর। দুজনে দেখা হল মুখোমুখি।

মমিনা বলে 'পথ দাও।'

জিন্নাত বলে 'পিছু হাঁটো।'

মমিনা বলে, সে মেয়ে, তার দাবি সকলের আগে। জিন্নাত বলে, তার দাবি মমিনার আগে, কেন-না সে আগে এসে সাঁকো ধরেছে। পথ এগিয়ে এসেছে আদ্ধেকেরও বেশি। এখন সে আর ফিরে যাবে না। এমন কোনোই নোটিশ টাঙানো নেই যে মেয়ে দেখলেই সাঁকোর থেকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

'হ্যাঁ দিতে হবে। আগুনে পর্যন্ত দিতে হবে।' চোখ ঝিলকিয়ে বললে মমিনা। কলসিটা ঢলে পড়ছিল, কোমরের খাঁজের ওপর তুলে চেপে ধরল আঁট করে। বাঁকা বাহুর বন্ধনীতে ফোটালে বা একটু নব-যৌবনের গরিমা।

'আগে আগুনে ঝাঁপ দিই, পরে না হয় পানিতে দেব।' জিন্নাতালি বললে।

'পথ ছাড়ো বলছি, রাগ-রঙ্গের জায়গা নয় এটা।' ঝলসে উঠল মমিনা : না ছাড়ো তো ফিরে গিয়ে বাজানকে বলে দেব।'

'আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার বাজানকে বলতে পারি।'

'কী বলবে তুমি?'

'বলব মকবুল মুছল্লির মেয়ে মমিনা বলেছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'ওমা কখন বললাম!'

'ঘরে নয়, বলেছে আমার মুখে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'দেবই তো একশোবার। নুড়ো জ্বেলে দেব।'

'তাই বাজানদের বললে লাভ হবে না, দাঙ্গা বেধে যাবে দুই বাজানে। আমার মুখে জ্বলুক নুড়ো, ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাও মমিনা।'

মমিনা চোখ নামাল। বললে, 'হাসির গল্প নেই তবু হাসি কী করে শুধু শুধু কারু ফরমায়েশে হাসা যায়?'

'চাঁদ কি কারু ফরমায়েশে হাসে? আর যার অমন চাঁদমুখ—'

মমিনা হেসে ফেলল। ছলছলে জলে চিকচিক করে উঠল রুপুলি চাঁদের টুকরো। খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল জিন্নাত। বাকি জলটুকু পার হয়ে গেল সাঁতরে।

শিকস্তি-পয়স্তির দেশ। নতুন চর উঠেছে। যে নদী ভেঙেছে সেই নদী দিয়েছে ভরাট করে।

জিন্নাতের বাপের নাম গফুরালি। সে বলে, আমার ভাঙা জমি আবার ভেসে উঠেছে। শিকল জরিপ করে জমি ভাঁউরে নিলেই বোঝা যাবে ঠিকঠাক।

মিথ্যা কথা। বলে মকবুল। মমিনার বাপ। বলে, নতুন চর, যখন আমার জমির লপ্ত, তখন আমার স্বত্ব।

প্রথমে ঝগড়া-বচসা। তর্কবিতর্ক। মন কষাকষি। শত্রুতালি। পক্ষাপক্ষি।

দুপক্ষের জমিদার দুপক্ষের পিছে এসে দাঁড়াল। ঠিক করলে প্রজাদের দ্যায় মামলা বসিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বত্ব বর্তিয়ে নেবে। পিছন থেকে উসকে দেয় ঘন ঘন।

কিন্তু মামলা বসানো মুখের কথা নয়। তার অনেক তোড়জোড় লাগে অনেক কাঠখড়। অনেক দলিল-দাখিলা। বাদী হওয়া সুবিধে না বিবাদী হওয়া এই নিয়ে সল্লা-পরামর্শ চলে। খালি দিন গোনে। চরে ঘাস গজায়। গজায় বনঝাউ।

একদিকে আদমপুর, অন্যদিকে ধুলেশ্বর। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। দেওয়ানি আদালতের ফেরফার আর গলিঘুঁজির মধ্যে তারা যেতে চায় না। তারা ল্যাজা-লাঠির তদারক করে। আমি হামি হব, বলে গফুরালি মকবুল বলে, আমি হামি হব। লাঠিতে তেল মাখায়, ল্যাজার মুখে পড়ে। শুরু হয় বুঝি হামলা-হামলি।

পলিমাটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলেছে উড়ি ধান। সমর্থ হয়ে উঠেছে আবাদের জন্য। সাজো-সাজো রব পড়ে গেল দুদিকে। গাজি-গাজি। সড়কি, বর্শা-বল্লম, ল্যাটা-লাঠি, ক্যাঁচা-টাঙি, দা-কুড়ুল দুদিকেই ঝকমক করে উঠল। চরের দখল নিয়ে বাধে বুঝি হাঙ্গামা।

আদমপুরের মোড়ল গফুরালি ধুলেশ্বরের মোড়ল মকবুল। দুজনের হাল-হালুটি বিস্তর, পাকা ভিতের ওপর টিনের ঘর অনেকগুলি। তাঁকে লোকলশকরের অভাব নেই। মোড়লে-মোড়লে ঝগড়া, কিন্তু দেখতে দেখতে ছেয়ে পড়ল তামাম গ্রামে। এ-ও এককাট্টা, ও-ও এককাট্টা।

... হলে হোক। কুছ পরোয়া নেই। মারপিট, খুনোখুনি, দাঙ্গা-.....হয়ে যাক হয়-নয়। এসপার কি ওসপার। আগে থেকে পুলিশে খবর দেবে না কেউ। পরে জেল-ফাটক হয় তো হবে। দ্বীপান্তরেও...। বুকের মাংসের চেয়ে দামি যে জমি, সেই জমির চেয়েও মান বড়ো। তার চেয়েও বড়ো হচ্ছে দখল।

উলু মাঠ ভেঙে চাষ শুরু করে দিল জিন্নাত। লাঙল দিলেই খড় ভেঙে যায়। মাটি ফেটে-ফেটে পড়ে। এক চাষ দিয়েছে, দুয়ারে-তিয়ারে ...নাই, আদমপুরের লোকেরা ছুটে এল দলে দলে। পাখা মেলা বাদুড়ের ঝাঁকের মতো।

গফুরালি হুকুম দিল, কোট-এলাকা বজায় রাখতে হবে। দখল যখন নিয়েছি একবার, বেদখল

হতে পারব না। ও হঠে গিয়ে আদালত করুক। থানায় গিয়ে এজাহার দিক। আমরা আমাদের গায়ের বস্ত্রের মতো জমি কামড়ে পড়ে থাকব।

উঠন্ত রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিশ-করা শানানো লৌহ-মুখ, উড়ল অনেক ধুলোমাটি, ফিনিক দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেওয়ার কথা সে-ও লাথি ছুঁড়ে মারে। হেরে গেল গফুরালির দল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চম্পট দিল খাল-নালা সাঁতরে। কিন্তু জিন্নাতালি ফিরল না।

জিন্নাতালি আটক পড়েছে শত্রুর কবজার মধ্যে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। খালাসি মোকদ্দমা করতে চাও তো করোগে, কিন্তু তার আগেই গুম হয়ে যাবে।

মুচলেকা দাও, এই চর মকবুল মুছল্লির—দাও মুক্তিপত্র। একটানা দখল নিতে দাও বারো বচ্ছর। রাজি হও তো ফিরিয়ে পাবে ছেলে। না হও তো .... করে ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়।

হাতে পায়ে কোমরে দড়ি বাঁধা, জিন্নাত শুয়ে আছে লকড়ি ঘরে। .... হোগলার উপর।

রাত গহিন, ঝিঁ-ঝি ডাকছে। জ্যোৎস্নায় মোছা-মোছা অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিন্নাতের। তার জ্বরো কপালের উপর কার মিঠে...ছোঁয়া।

'কে'?

'আমি গো আমি। মমিনা।'

.... মিঠানিতে জ্বর জুড়িয়ে গেল গায়ের। যেন স্বপন দেখছে, জিন্নাত।

.... হয়েছে তোমার?'

.... লেগেছে ডান হাতে, বাঁ কাঁধের ওপর। ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছে দু'হাত। কিন্তু বেতাগী ল্যাজা ফসকে গেছে, বিঁধতে পারেনি বুকের মধ্যে।

'এইখানে লেগেছে?' হাতের মিঠানি কপালের থেকে চলে আসে তার উপর।

'এখন আর ব্যথা নেই। শুধু দড়ির বাঁধনটাই যা ফেলেছে বেকায়দায়।

সত্যি, সমস্ত জ্বর-জ্বালা, ব্যথা-বেদনা যেন সব উবে গিয়েছে পরশে। ফুটন্ত গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন আমেজ। নতুন ফোটা কদমের গন্ধ পাচ্ছে মৃদু-মৃদু। দড়ির গিট খুলতে লাগল মমিনা।

'এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ গা থেকে?'

'হ্যাঁ, ছোটো ছোটো আঙুলে বিন্দু-বিন্দু স্পর্শের শিশির ঢেলে...মমিনা বললে, 'এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। আর রাতে সরদার-চাঁইয়েরা হল্লা-ফুর্তি করেছে। জবল দখল তো করেইছে, হটিয়ে দিয়েছে বিপক্ষদের। তার উপরে কয়েদ করেছে ও দলের সাজোয়ানের ছেলেকে কিন্তু আমি শুধু কেঁদেছি।'

'একি ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে? জানতে পারলে তোমার কী সর্বনাশ হবে জানো?'

'জানতে পারবে না।'

'পারবে না মানে?

'মানে জানতে পারলেও কিছু করতে পারবে না আমার।'

'তা কী করে বলছ?'

'বলছি আমিও ছাড়া পাব তোমার সঙ্গে।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব।'

'চলে যাবে? কোথায়?'

'বল্লভপুরের কাজির কাছে। জানো তো, কাজি কুরমান মোল্লা আমার খালু। নদীর দু'বাঁক পরেই বল্লভপুর।'

'সেখনে কী?'

'সেখানে গিয়ে কাজির দরবারে কাবিলনামা রেজেস্ট্রি করব। তোমার সঙ্গে আমার শাদি হবে। তুমি দুলহা আর আমি দুলহিন।' কথার মাঝে লজ্জা আর আনন্দের মিশেল। সাহস আর ব্যাকুলতার।

গায়ের রক্ত শির শির করে উঠল জিন্নাতের। বললে, 'তোমার বাপ-মা রাজি হবে?'

'না হোক। আমি তো আর নাবালগা নই যে অলি লাগবে বিয়েতে আমি বালিগ হয়েছি গেল পৌষ মাসে। পনেরো বছর পেরিয়ে গেছি আমি তা আমি সাবিদ করতে পারব। আমাদের বিয়ে তুড়তে পারবে না কেউ, কিছুতেই না।'

বিয়ে হবে আমাদের?' ঘোর-ঘোর চোখে এখনো স্বপ্ন দেখছে জিন্নাত?'

হ্যাঁ, তোমার খেদমতে থাকব চিরকাল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে দু'পক্ষের। যে চর আমার বাজান বলেছে আমার, আর তোমার বাজান বলেছে তার, সে-চর তারা দুয়ে মিলে আমাদের দুজনকে জায়গির দিয়ে দেবে। নাইয়ের যেতে-আসতে হবে আমাকে, বাঁশের দুধারে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দু'গ্রামে ফিরে আসবে মিল-মহব্বত। তাছাড়া আমি তো আর পথ দেখি না। নইলে চিরকাল দু'দল কেবল মারামারি করবে? আমার মনের মানুষের গায়ে ঝরবে রক্ত আর আমার চোখে ঝরবে দরিয়ার পানি!'

কী করে যাবে মমিনা?' জিন্নাত উঠে বসল।

'ঘাটে ডোঙা আছে মাছ ধরার। তাতে করে পালাব।' কালো চোখে আলো জ্বলল মমিনার।

'আমার হাত যে ভাঙা। তুমি শুধু হালটা ধরে বসে থাকবে। পারবে না?'

'পারব'।

'তবে চলো। নদীর নাম আঁধারমানিক। আঁধার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি।'

দুজনেই ত্রস্ত হালকা পায়ে চলে এল নদীর পারে। বাদাম গাছের নীচে নৌকো বাঁধা। হালকা মেছো ডিঙি।

'হাল-দাঁড় কই?' জিজ্ঞেস করল জিন্নাত।

'ও!' বুঝতে পেরেছে মমিনা। সব আশা-সোটা হয়েছে দাঙ্গার উরদিশে। বলে, 'তুমি একটু বোসো। উঠোনে মুলি-বাঁশ আছে, তাই দুটো নিয়ে আসি কুড়িয়ে। লগি ঠেলে-ঠেলে চলে যাব দুজনে। তুমি যদি না পারো আমি একা বাইব। ভাটির নদী তরতরিয়ে বয়ে যাবে।' মমিনা ফিরে গেল।

এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গামা-হুজ্জুতের, আক্রোশ-আক্রমণের! একটা মেয়েকে বিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়দঙ্গল, ...কোন্দল, চোট-জখম, এত রক্তপাত—সব এমনি করে রফানিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এমনিভাবে ভুলে যেতে হবে হার-মার,

ঘায়ে মলম লাগাতে হবে .... করে। বাজানকে গিয়ে বলবে, মোল্লার কাছে কেতাব-কলমা পড়ে নিয়েছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে।

সে না মরদের বাচ্চা?

কিন্তু উপায় কী। এ যে একটা মেয়ে নয় খালি, এ যে মমিনা, নদীর নামে তারও নাম। সে যে আঁধারমানিক।

ছোটো দেখে দুটো হালকা বাঁশ নিয়ে এল মমিনা। এসে দেখে জিন্নাত নেই ডোঙাও নেই। দুহাতে জল কেটে-কেটে বেরিয়ে গেছে সে অনেক দূরে। ওই দেখা যায়।

ভাঙা চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার .... বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর আভাস দেখা যায় .... ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধারমানিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল জিন্নাতের দু'হাতে হঠাৎ এত জোর এল কী করে?